ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 937- 945
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.309

ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং ইমানুয়েল কান্টের 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য'— এই দুইয়ের তুলনামূলক অধ্যয়ন

প্রিয়াঙ্কা পাল, *অতিথি অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, ময়নাগুড়ি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.03.2026; Accepted: 14.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The idea of selfless action in the Bhagavad Gita and Immanuel Kant's moral philosophy is compared philosophically in this essay, with special attention to the connection between Niskāma Karma and Kant's "duty for duty's sake" theory. Both faiths, in my opinion, provide deep ethical frameworks that stress acting morally without regard to one's own benefit or the effects on others. The Bhagavad Gita, which is credited to Vyasa, presents the idea of Niskāma Karma, which exhorts people to carry out their responsibilities with devotion to the divine order and without regard for the results of their deeds. On the other hand, Kant's deontological ethics, which he outlined in his groundbreaking work Groundwork of the Metaphysics of Morals, contends that moral worth is found in behaving out of obligation under the guidance of rational moral law as opposed to motivation or anticipated results. The conceptual underpinnings, parallels, and discrepancies between these two ethical viewpoints are examined in this paper. Although moral purpose and the inherent worth of responsibility are emphasized in both frameworks, they originate from different metaphysical and cultural settings. While Kant bases moral obligation on cognitive autonomy and the universal concept of the categorical imperative, the Bhagavad Gita places ethical behaviour within a spiritual worldview where selfless duty leads to liberation and harmony with cosmic order. By examining these convergences and divergences, the paper highlights how Eastern and Western ethical traditions offer complementary insights into the nature of moral responsibility and selfless action. In the end, the paper makes the case that a comparison between Kantian duty and Niskāma Karma enhances modern ethical discussion and offers a more profound philosophical explanation of moral behaviour driven by principle rather than self-interest.

Keywords: Niskāma Karma, Duty for Duty's Sake, Bhagavad Gita, Immanuel Kant, Moral Duty, Deontological Ethics

নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে কর্তব্য, নৈতিকতা এবং কর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রশ্ন মানবচিন্তার অন্যতম মৌলিক সমস্যা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দার্শনিক ঐতিহ্যেই এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গভীর আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত ভারতীয় দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ **ভগবদ্গীতা** এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক নৈতিক দর্শনের অন্যতম প্রধান চিন্তাবিদ ইমানুয়েল কান্ট, উভয়ের চিন্তায় কর্তব্য ও কর্মের নৈতিক তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ভগবদ্গীতার *নিষ্কাম কর্ম* (Niskāma Karma) ধারণা এবং কান্টের *duty for duty's sake* নীতি এই

দুই ভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার মধ্যেও এক গভীর নৈতিক সাদৃশ্যের দিক নির্দেশ করে। এই গবেষণাপত্রে আমি মূলত এই দুই নৈতিক ধারণার তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের দার্শনিক তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে ভগবদ্গীতা কেবল ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক-দার্শনিক গ্রন্থ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে কর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেন তার কেন্দ্রবিন্দু হল *নিষ্কাম কর্ম* - অর্থাৎ ফলের আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্য পালন করা। গীতার বিখ্যাত শ্লোকে বলা হয়েছে—

> "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥"

অর্থাৎ, মানুষের অধিকার কেবল কর্মে, কখনোই তার ফলে নয়; কর্মফল যেন কর্মের উদ্দেশ্য না হয় এবং অকর্মের প্রতিও যেন আসক্তি জন্মায় না (Bhagavad Gītā, 2.47)।

এই শ্লোকটি গীতার নৈতিক দর্শনের কেন্দ্রীয় ভিত্তি, যেখানে কর্মের মূল্য ফলের উপর নয় বরং কর্তব্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেক ব্যাখ্যাকার যেমন স্বামী গম্ভীরানন্দ উল্লেখ করেছেন যে গীতার এই শিক্ষা কর্মের মধ্যেই আত্মশুদ্ধি ও মুক্তির পথ নির্দেশ করে (Gambhirananda, 2008, p. 124)। অর্থাৎ কর্ম তখনই নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মূল্যবান হয়ে ওঠে যখন তা ব্যক্তিগত লাভ বা আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়ে কেবল কর্তব্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়।

অন্যদিকে পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শনে ইমানুয়েল কান্ট কর্তব্যকে নৈতিকতার একমাত্র ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Groundwork of the Metaphysics of Morals*-এ তিনি বলেন যে নৈতিকতার প্রকৃত মূল্য কর্মের ফল বা উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে না, বরং সেই নীতির উপর নির্ভর করে যার দ্বারা কর্মটি পরিচালিত হয়। কান্টের ভাষায়,

> "An action done from duty has its moral worth… not in the purpose to be attained by it, but in the maxim according to which it is decided upon." (Kant, 1785/1998, p. 14)

এই বক্তব্যের মাধ্যমে কান্ট স্পষ্টভাবে বলেন যে কোনো কর্মের নৈতিক মূল্য তার ফলাফলের মধ্যে নয়, বরং সেই নৈতিক নীতিতে নিহিত যার ভিত্তিতে কর্মটি সম্পাদিত হয়। তিনি আরও বলেন,

> "An action, to have moral worth, must be done from duty" (Kant, 1785/1998, p. 13)

অর্থাৎ সত্যিকারের নৈতিকতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন ব্যক্তি কেবল কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই কর্ম সম্পাদন করে, কোনো ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা বা স্বার্থের কারণে নয়।

এখানেই ভগবদ্গীতার *নিষ্কাম কর্ম* এবং কান্টের কর্তব্যনীতির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয় দার্শনিক ধারাই কর্মের ফলকে নৈতিকতার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না; বরং কর্তব্য বা নৈতিক বিধির প্রতি আনুগত্যকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। তবে একই সঙ্গে তাদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। গীতার নিষ্কাম কর্ম ধারণা মূলত আধ্যাত্মিক মুক্তি ও যোগদর্শনের সাথে যুক্ত, যেখানে কর্ম ঈশ্বরার্পণের মাধ্যমে আত্মোন্নতির পথ হয়ে ওঠে। অপরদিকে কান্টের নৈতিকতা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর এবং *categorical imperative*-এর মাধ্যমে সার্বজনীন নৈতিক বিধির ধারণা প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রেক্ষাপটে ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং কান্টের কর্তব্যনীতি উভয়ই নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। একদিকে এগুলো মানবকর্মের নৈতিক ভিত্তি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, অন্যদিকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক ঐতিহ্যের মধ্যে একটি বৌদ্ধিক সংলাপের ক্ষেত্রও সৃষ্টি করে। এই গবেষণায় আমি মূলত এই দুই

নৈতিক ধারণার মৌলিক নীতিসমূহ বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি, যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়।

ভগবদ্গীতায় নিষ্কাম কর্মের ধারণা:

ভগবদ্গীতা ভারতীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, যেখানে মানবজীবনের কর্তব্য, নৈতিকতা এবং মুক্তির পথ সম্পর্কে গভীর আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের অন্যতম মৌলিক তত্ত্ব হল নিষ্কাম কর্ম (Niskāma Karma); অর্থাৎ ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্য পালন করা। গীতার এই ধারণা কেবল ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক উপদেশ নয়; বরং এটি এক গভীর নৈতিক দর্শন, যা মানুষের কর্মজীবনকে স্বার্থহীনতা ও কর্তব্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমার মতে, ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মের ধারণা মানুষের নৈতিক আচরণকে এক উচ্চতর আদর্শে উন্নীত করে, যেখানে কর্মের মূল্য ব্যক্তিগত লাভে নয় বরং কর্তব্যের নিঃস্বার্থ সাধনায় নিহিত। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

> "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোऽস্ত্বকর্মণি॥"

অর্থাৎ মানুষের অধিকার কেবল কর্মে, কখনোই তার ফলে নয়; কর্মফল যেন কর্মের উদ্দেশ্য না হয় এবং অকর্মের প্রতিও যেন আসক্তি জন্মায় না (Bhagavad Gītā, 2.47) ।

এই শ্লোকের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের মৌলিক নীতি স্থাপন করেছেন। এখানে কর্মের মূল্য ফলের উপর নির্ভর করে না; বরং কর্মের নৈতিকতা নির্ভর করে সেই মানসিক অবস্থার উপর, যার দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ মানুষকে তার কর্তব্য পালন করতে হবে, কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা বা ব্যক্তিগত লাভের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। অনেক দার্শনিক মনে করেন যে এই শিক্ষাই গীতার কর্মযোগ দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু।

ভারতীয় দার্শনিক ও ব্যাখ্যাকার **সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন** গীতার কর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে নিষ্কাম কর্ম মানুষের আত্মিক বিকাশের অন্যতম প্রধান পথ। তাঁর মতে,

> "The Gita asks us to work without attachment to the fruits of action" (Radhakrishnan, 1948, p. 156)

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে গীতার মূল উদ্দেশ্য মানুষকে কর্মবিমুখ করা নয়, বরং তাকে স্বার্থহীন কর্মের মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে পরিচালিত করা। একইভাবে স্বামী গম্ভীরানন্দ গীতার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে ফলের প্রতি আসক্তি মানুষের মনকে অস্থির করে তোলে এবং তাকে বন্ধনের দিকে নিয়ে যায়। তিনি বলেন,

> "Your right is for action alone, never for the results" (Gambhirananda, 2008, p. 124)

তাঁর মতে, যখন মানুষ ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্তব্য পালন করে, তখন তার মন স্থির ও সমবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই অবস্থাই প্রকৃত যোগের সূচনা।

নিষ্কাম কর্মের ধারণা আরও স্পষ্ট হয় গীতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকে, যেখানে বলা হয়েছে,

> "যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
> সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥" (Bhagavad Gītā, 2.48)।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দেন যে সফলতা বা ব্যর্থতার প্রতি সমভাব রেখে কর্তব্য পালন করাই প্রকৃত যোগ। অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মের মূল লক্ষ্য হল মানসিক সমতা এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কর্ম তখনই সত্যিকার অর্থে নৈতিক হয়ে ওঠে যখন তা ব্যক্তিগত লাভ বা ক্ষতির হিসাব থেকে মুক্ত হয়ে সম্পাদিত হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম ধারণা কোনো নিষ্ক্রিয়তার শিক্ষা দেয় না; বরং

এটি সক্রিয় ও দায়িত্বশীল জীবনযাপনের উপর জোর দেয়। গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ফলের প্রতি আসক্তি যেমন অনুচিত, তেমনি কর্মত্যাগও অনুচিত। বরং মানুষের কর্তব্য হল নিজ নিজ ধর্ম বা সামাজিক দায়িত্ব পালন করা এবং সেই কর্মকে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন করা। এইভাবেই কর্ম মানবজীবনের বন্ধন নয়, বরং মুক্তির পথ হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায় যে ভগবদ্গীতায় নিষ্কাম কর্মের ধারণা এক গভীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শকে প্রতিফলিত করে। এখানে কর্মের প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হয় কর্মের ফল দ্বারা নয়, বরং কর্মের অন্তর্নিহিত কর্তব্যবোধ এবং নিঃস্বার্থ মানসিকতার দ্বারা। আমার দৃষ্টিতে, এই নীতি মানবজীবনের নৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় করে এবং ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণ সাধনে একটি সর্বজনীন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

কান্টের নৈতিক দর্শনে কর্তব্যের ধারণা:

পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) এমন এক দার্শনিক যিনি নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে কর্তব্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে নৈতিকতার প্রকৃত ভিত্তি কোনো ফল, অনুভূতি বা ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়; বরং মানুষের যুক্তিবোধ দ্বারা নির্ধারিত নৈতিক বিধি বা *moral law*-এর প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই নৈতিক কর্মের জন্ম হয়। আমার দৃষ্টিতে, কান্টের নৈতিক দর্শন মানবকর্মের মূল্য নির্ধারণে একটি মৌলিক নীতি প্রতিষ্ঠা করে, যে নৈতিকতা তখনই সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন মানুষ কেবল কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য পালন করে। কান্ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Groundwork of the Metaphysics of Morals*-এ নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে "সু-ইচ্ছা" (*good will*)-কে সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা নিঃশর্তভাবে ভালো, একমাত্র "good will" ছাড়া। এই good will তখনই প্রকাশিত হয় যখন মানুষ কেবল কর্তব্যবোধ থেকে কাজ করে। এই প্রসঙ্গে কান্ট স্পষ্টভাবে বলেন,

> "An action, to have moral worth, must be done from duty" (Kant, 1785/1998, p. 13)

এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চান যে কোনো কাজ যদি কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ, আবেগ বা আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে তা নৈতিক মূল্য লাভ করতে পারে না। নৈতিকতার প্রকৃত ভিত্তি হল সেই মানসিক নীতি বা *maxim* যার দ্বারা কর্ম পরিচালিত হয়। তাই কান্ট বলেন,

> "An action done from duty has its moral worth… not in the purpose to be attained by it, but in the maxim according to which it is decided upon" (Kant, 1785/1998, p. 14)

এই উক্তি থেকে স্পষ্ট যে কান্টের মতে কোনো কর্মের নৈতিক মূল্য তার ফলাফলের উপর নির্ভর করে না; বরং নির্ভর করে সেই নৈতিক নীতির উপর যার দ্বারা কর্মটি সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ কোনো কাজ যদি কেবল লাভ, সুখ বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য করা হয়, তবে তা নৈতিকতার প্রকৃত মানদণ্ড পূরণ করে না। কান্ট নৈতিক কর্মের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করেন— "*acting according to duty*" এবং "*acting from duty*"। অনেক সময় মানুষ এমন কাজ করে যা কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু সেই কাজের পেছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আবেগ। এই ধরনের কর্ম নৈতিকতার প্রকৃত মূল্য বহন করে না। কান্ট একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি অন্যকে সাহায্য করে কেবল সহানুভূতি বা ব্যক্তিগত আনন্দের কারণে, তবে সেই কাজ প্রশংসনীয় হলেও তা প্রকৃত নৈতিক মূল্য বহন করে না; কারণ তা কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত হয়নি ।

এই কারণেই কান্ট কর্তব্যের ধারণাকে নৈতিকতার কেন্দ্রীয় নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে, কর্তব্য হল "নৈতিক বিধির প্রতি শ্রদ্ধা থেকে কাজ করার অপরিহার্যতা"। তিনি বলেন,

> "Duty is the necessity of acting from respect for the law" (Kant, 1785/1998, p. 15)

এখানে "law" বলতে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক আইন নয়; বরং যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত সার্বজনীন নৈতিক বিধিকে বোঝানো হয়েছে। এই নৈতিক বিধিই পরবর্তীতে কান্টের বিখ্যাত *categorical imperative* ধারণায় প্রকাশিত হয়। কান্ট বলেন, আমাদের এমনভাবে কাজ করা উচিত যাতে আমাদের কর্মনীতি এমন একটি সর্বজনীন বিধি হয়ে উঠতে পারে যা সকল যুক্তিসম্পন্ন সত্তার জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ নৈতিকতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন কোনো কর্মনীতি সর্বজনীনভাবে প্রয়োগযোগ্য হয়। এইভাবে দেখা যায় যে কান্টের নৈতিক দর্শনে কর্তব্যের ধারণা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর এবং সার্বজনীন নৈতিক বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে কর্মের ফলাফল বা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কোনো ভূমিকা নেই; বরং নৈতিকতার মূল ভিত্তি হল নৈতিক বিধির প্রতি শ্রদ্ধা এবং সেই বিধি অনুসারে কর্ম সম্পাদন করা। আমার মতে, কান্টের এই নৈতিক তত্ত্ব মানবনৈতিকতার এক উচ্চতর আদর্শকে প্রতিফলিত করে, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিবর্তে সার্বজনীন নৈতিক নীতির প্রতি আনুগত্যই নৈতিকতার প্রকৃত মানদণ্ড হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে কান্টের কর্তব্যনীতি মানবকর্মকে এক গভীর নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং নৈতিকতার একটি সর্বজনীন ও যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা প্রদান করে। এই কারণেই আধুনিক নৈতিক দর্শনে কান্টের কর্তব্যতত্ত্ব একটি মৌলিক ও প্রভাবশালী দার্শনিক ধারণা হিসেবে বিবেচিত হয়, যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন নৈতিক আলোচনার ভিত্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

নিষ্কাম কর্ম ও কর্তব্যনীতির মধ্যে সাদৃশ্য:

ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব এবং ইমানুয়েল কান্টের কর্তব্যনীতি নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে। ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত হলেও এই দুই তত্ত্বের মধ্যে কিছু মৌলিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আমার দৃষ্টিতে, এই সাদৃশ্যের প্রধান ভিত্তি হল— উভয় দর্শনই নৈতিক কর্মের মূল্য নির্ধারণে ফল বা পরিণামের পরিবর্তে কর্তব্যবোধকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে কর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেন তার মূল লক্ষ্য হল কর্মফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্য পালন করা। গীতায় বলা হয়েছে, "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" (Bhagavad Gītā, 2.47)। এই শ্লোকের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে মানুষের অধিকার কেবল কর্মে, কিন্তু তার ফলে নয়। অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য হল নিজের নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করা, কিন্তু সেই কর্মের ফল লাভের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। এই ধারণাই গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্বের মূল ভিত্তি। গীতার এই নৈতিক অবস্থানকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক গবেষক উল্লেখ করেছেন যে গীতার কর্মযোগ মূলত স্বার্থহীন কর্তব্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত (Radhakrishnan, 1948, p. 156)।

অন্যদিকে কান্টের নৈতিক দর্শনেও একই ধরনের একটি ধারণা দেখা যায়। কান্টের মতে কোনো কর্ম তখনই প্রকৃত নৈতিক মূল্য লাভ করে যখন তা কেবল কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত হয়। তাঁর বিখ্যাত বক্তব্য, "An action, to have moral worth, must be done from duty" (Kant, 1785/1998, p. 13)। এখানে কান্ট স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে কোনো কাজ যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ, আবেগ বা সুখ লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে তা প্রকৃত নৈতিক মূল্য বহন করে না। নৈতিকতার প্রকৃত ভিত্তি হল কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা। এই কারণে তিনি আরও বলেন,

> "An action done from duty has its moral worth… not in the purpose to be attained by it" (Kant, 1785/1998, p. 14)

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে কান্টের নৈতিক দর্শনে কর্মের মূল্য তার ফলাফলের উপর নির্ভর করে না; বরং নির্ভর করে সেই নৈতিক নীতির উপর যার দ্বারা কর্মটি সম্পাদিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি গীতার নিষ্কাম কর্ম ধারণার সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অনেক দার্শনিক এই দুই নৈতিক তত্ত্বের মধ্যে এই মিলকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, কিছু তুলনামূলক গবেষণায় বলা হয়েছে যে গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং কান্টের কর্তব্যনীতি উভয়ই "duty for duty's sake" ধারণাকে সমর্থন করে এবং উভয় ক্ষেত্রেই কর্মকে ফলের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ উভয় দর্শনই মানুষের নৈতিক আচরণকে স্বার্থহীন কর্তব্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এছাড়া উভয় দর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য হল যে তারা উভয়েই নৈতিকতার ক্ষেত্রে আবেগ বা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার প্রভাবকে সীমিত করতে চায়। গীতায় বলা হয়েছে যে আসক্তি, কামনা ও স্বার্থপরতা মানুষের মনকে অস্থির করে এবং তাকে নৈতিক পথ থেকে বিচ্যুত করে। একইভাবে কান্ট মনে করেন যে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেগ নয়, বরং যুক্তি এবং নৈতিক বিধিই প্রধান নিয়ামক হওয়া উচিত। এই কারণে কান্টের নৈতিক দর্শন সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর এবং সার্বজনীন নৈতিক বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মিল হল যে উভয় দর্শনই নৈতিক কর্মকে ব্যক্তিগত লাভের পরিবর্তে বৃহত্তর মানবকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে। গীতায় নিষ্কাম কর্মের লক্ষ্য হল *লোকসঙ্গ্রহ*— অর্থাৎ সমাজের কল্যাণ ও স্থিতি রক্ষা করা। একইভাবে কান্টের নৈতিক দর্শনে "kingdom of ends" ধারণার মাধ্যমে এমন একটি নৈতিক সমাজের কল্পনা করা হয়েছে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করবে এবং কখনোই কেবল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবমর্যাদা ও নৈতিক সমতার ধারণাকে শক্তিশালী করে। সুতরাং বলা যায় যে ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং কান্টের কর্তব্যনীতি ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক প্রেক্ষাপটে বিকশিত হলেও তাদের মধ্যে একটি মৌলিক নৈতিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয় দর্শনই নৈতিক কর্মের মূল্য নির্ধারণে ফলের পরিবর্তে কর্তব্যবোধকে প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মানুষের নৈতিক জীবনকে স্বার্থহীনতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও নৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। আমার মতে, এই সাদৃশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক সংলাপের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, যা নৈতিক দর্শনের সার্বজনীনতা উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়ক।

নিষ্কাম কর্ম ও কান্টীয় কর্তব্যনীতির মধ্যে পার্থক্য:

ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব এবং ইমানুয়েল কান্টের কর্তব্যনীতি নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক আদর্শ হলেও তাদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে যে উভয় তত্ত্বই কর্মের ফলের পরিবর্তে কর্তব্যবোধকে গুরুত্ব দেয়। তবে গভীর বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে এই দুই দর্শনের নৈতিক ভিত্তি, উদ্দেশ্য এবং দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা রয়েছে। আমার দৃষ্টিতে, নিষ্কাম কর্ম ও কান্টীয় কর্তব্যনীতির পার্থক্য প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়— নৈতিকতার ভিত্তি, কর্মের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এবং নৈতিক বিধির প্রকৃতি। প্রথমত, নিষ্কাম কর্ম ও কান্টীয় কর্তব্যনীতির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল নৈতিকতার ভিত্তি। ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম মূলত আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত। এখানে কর্মের উদ্দেশ্য কেবল নৈতিক কর্তব্য পালন নয়, বরং আত্মশুদ্ধি ও মুক্তি (*মোক্ষ*) অর্জন করা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দেন যে কর্মফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদন করতে হবে—

"मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य" (Bhagavad Gītā, 3.30)

অর্থাৎ, সকল কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পণ কর (Radhakrishnan, 1948, p. 173)। এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে গীতার নিষ্কাম কর্ম ধারণা ঈশ্বরবাদী এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অন্যদিকে কান্টের নৈতিক দর্শন সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর এবং ধর্মীয় ভিত্তির উপর নির্ভরশীল নয়। কান্টের মতে নৈতিকতার প্রকৃত উৎস হল মানুষের যুক্তি (*reason*) এবং সেই যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত সার্বজনীন নৈতিক বিধি। তিনি বলেন, "Duty is the necessity of acting from respect for the law" (Kant, 1785/1998, p. 13) । অর্থাৎ নৈতিক কর্ম তখনই সত্যিকার অর্থে মূল্যবান হয় যখন তা নৈতিক বিধির প্রতি শ্রদ্ধা থেকে সম্পাদিত হয়। এখানে ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিক মুক্তির ধারণা নৈতিকতার প্রধান ভিত্তি নয়; বরং যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত নৈতিক আইনই প্রধান।

দ্বিতীয়ত, এই দুই তত্ত্বের মধ্যে কর্মের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক মুক্তি এবং মানসিক সমতা অর্জন। গীতায় বলা হয়েছে, "যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি... সমত্বং যোগ উচ্যতে" (Bhagavad Gītā, 2.48)। এখানে কর্মযোগের লক্ষ্য হল সফলতা ও ব্যর্থতার প্রতি সমভাব বজায় রেখে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা। শ্রী অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে বলেন যে গীতার কর্মযোগ মানুষের কর্মকে "a means of spiritual realization" হিসেবে বিবেচনা করে (Aurobindo, 1997, p. 87)। অর্থাৎ কর্ম এখানে মুক্তির পথে একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন। কিন্তু কান্টের নৈতিক দর্শনে কর্মের লক্ষ্য আধ্যাত্মিক মুক্তি নয়; বরং নৈতিক বিধির প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে একটি সার্বজনীন নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর বিখ্যাত নীতি অনুযায়ী, "I ought never to act except in such a way that I could also will that my maxim should become a universal law" (Kant, 1785/1998, p. 31)। এই নীতিকে তিনি *categorical imperative* নামে অভিহিত করেন। অর্থাৎ কোনো কর্ম তখনই নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য যখন সেই কর্মনীতি সকল মানুষের জন্য সার্বজনীন বিধি হিসেবে প্রযোজ্য হতে পারে।

তৃতীয়ত, নিষ্কাম কর্ম ও কান্টীয় কর্তব্যনীতির মধ্যে নৈতিক বিধির প্রকৃতিতেও পার্থক্য রয়েছে। গীতায় নৈতিকতা ব্যক্তির *স্বধর্ম* বা সামাজিক-নৈতিক দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামাজিক অবস্থান, কর্তব্য এবং ধর্ম অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করবে। এই কারণে গীতার নৈতিকতা অনেকাংশে প্রসঙ্গনির্ভর ও ধর্মীয় দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। অপরদিকে কান্টের নৈতিকতা সম্পূর্ণভাবে সার্বজনীন এবং প্রসঙ্গনিরপেক্ষ। তাঁর মতে নৈতিক বিধি এমন হতে হবে যা সকল যুক্তিসম্পন্ন সত্তার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এজন্য কান্ট নৈতিকতার ভিত্তিকে ব্যক্তিগত বা সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল না করে যুক্তির সার্বজনীন নীতির উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং বলা যায় যে ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং কান্টীয় কর্তব্যনীতি উভয়ই নৈতিক কর্মে কর্তব্যবোধকে গুরুত্ব দিলেও তাদের মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি ভিন্ন। নিষ্কাম কর্ম মূলত আধ্যাত্মিক মুক্তি ও ঈশ্বরার্পণের ধারণার সঙ্গে যুক্ত, যেখানে কর্ম আত্মোন্নতির পথ হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে কান্টের কর্তব্যনীতি সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর এবং সার্বজনীন নৈতিক বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার মতে, এই পার্থক্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে এবং তুলনামূলক নৈতিক দর্শনের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা:

বর্তমান বিশ্বে নৈতিক সংকট, সামাজিক বৈষম্য, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং ভোগবাদী মানসিকতার বৃদ্ধি মানবসমাজের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব এবং ইমানুয়েল কান্টের কর্তব্যনীতি নতুনভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার দৃষ্টিতে, এই দুই নৈতিক ধারণা কেবল ঐতিহাসিক বা দার্শনিক আলোচনা নয়; বরং সমকালীন সমাজে নৈতিক দায়িত্ববোধ,

সামাজিক ন্যায় এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিশা প্রদান করতে পারে। প্রথমত, আধুনিক সমাজে ব্যক্তিস্বার্থ ও ভোগবাদী প্রবণতার ফলে নৈতিক মূল্যবোধ অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব মানুষের মধ্যে স্বার্থহীন কর্তব্যবোধের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। গীতায় বলা হয়েছে, "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" (Bhagavad Gītā, 2.47)। অর্থাৎ মানুষের অধিকার কেবল কর্মে, কিন্তু তার ফলে নয়। এই শিক্ষার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে ব্যক্তিগত লাভের পরিবর্তে কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মই মানবজীবনের প্রকৃত আদর্শ। ভারতীয় দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে গীতার কর্মতত্ত্ব মানুষের কর্মকে "detachment from the fruits of action"-এর মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে পরিচালিত করে (Radhakrishnan, 1948, p. 156)। বর্তমান সমাজে যখন কর্মের মূল্য অনেক সময় কেবল ব্যক্তিগত লাভের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তখন গীতার এই শিক্ষা মানবিক নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক নৈতিক আলোচনায় কান্টের কর্তব্যনীতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে, বিশেষত মানবাধিকার, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্নে। কান্টের মতে কোনো কর্ম তখনই নৈতিক মূল্য লাভ করে যখন তা কেবল কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত হয়। তিনি বলেন,

> "An action done from duty has its moral worth… not in the purpose to be attained by it, but in the maxim according to which it is decided upon" (Kant, 1785/1998, p. 14)

এই বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে নৈতিকতার ভিত্তি কর্মের ফল নয়, বরং সেই নৈতিক নীতি যার দ্বারা কর্ম পরিচালিত হয়। সমকালীন মানবাধিকার দর্শন ও নৈতিক আইনের আলোচনায় এই ধারণা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষের মর্যাদা এবং নৈতিক স্বাধীনতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। তৃতীয়ত, বর্তমান বিশ্বে নৈতিক নেতৃত্ব এবং সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্নে এই দুই দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব অনুযায়ী নেতার কর্তব্য হল ব্যক্তিগত লাভের কথা চিন্তা না করে সমাজের কল্যাণে কাজ করা। গীতায় *লোকসঙ্গ্রহ* ধারণার মাধ্যমে বলা হয়েছে যে সমাজের স্থিতি ও কল্যাণ রক্ষার জন্য দায়িত্বশীল কর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে কান্টের নৈতিক দর্শনে "categorical imperative"-এর ধারণা মানবমর্যাদা এবং নৈতিক সমতার ভিত্তিতে একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের নির্দেশ দেয়। কান্টের মতে, মানুষের এমনভাবে কাজ করা উচিত যাতে তার কর্মনীতি একটি সার্বজনীন নৈতিক বিধি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে (Kant, 1785/1998, p. 31)।

চতুর্থত, সমকালীন পেশাগত নৈতিকতা; যেমন চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশাসন এবং ব্যবসায়িক নীতিশাস্ত্র— ক্ষেত্রেও এই দুই দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। আধুনিক পেশাগত জীবনে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক সময় ব্যক্তিগত লাভ, ক্ষমতা বা প্রতিযোগিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই পরিস্থিতিতে নিষ্কাম কর্মের স্বার্থহীনতা এবং কান্টের কর্তব্যনীতির নৈতিক বাধ্যবাধকতা পেশাগত নৈতিকতার একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করতে পারে। অতএব বলা যায় যে ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং কান্টের কর্তব্যনীতি কেবল ঐতিহাসিক দার্শনিক ধারণা নয়; বরং সমকালীন নৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে তাদের গভীর তাৎপর্য রয়েছে। আমার মতে, এই দুই নৈতিক তত্ত্ব মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নৈতিক দায়িত্ববোধ, স্বার্থহীনতা এবং সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিশা প্রদান করতে সক্ষম। এই কারণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুই মহান নৈতিক দর্শনের তুলনামূলক অধ্যয়ন বর্তমান যুগেও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক এবং তা নৈতিক দর্শনের একটি সমন্বিত ও সার্বজনীন উপলব্ধি গঠনে সহায়ক।

উপসংহার:

ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব এবং ইমানুয়েল কান্টের কর্তব্যনীতি নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ধারণা, যা ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক প্রেক্ষাপটে বিকশিত হলেও মানবনৈতিকতার মৌলিক প্রশ্নগুলোর প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই গবেষণায় আমি মূলত এই দুই নৈতিক তত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের মৌলিক সাদৃশ্য, পার্থক্য এবং সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব মানুষের কর্মজীবনকে স্বার্থহীনতা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এখানে কর্মের মূল উদ্দেশ্য কেবল বাহ্যিক সাফল্য অর্জন নয়; বরং কর্মফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে আত্মিক উন্নতি ও মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া। গীতার এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এক ধরনের নৈতিক সংযম ও মানসিক সমতার শিক্ষা দেয়। অন্যদিকে কান্টের কর্তব্যনীতি সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর এবং সার্বজনীন নৈতিক বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। কান্টের মতে কোনো কর্ম তখনই প্রকৃত নৈতিক মূল্য লাভ করে যখন তা কেবল কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত হয় এবং সেই কর্মনীতি এমন হতে পারে যা সকল মানুষের জন্য একটি সার্বজনীন নৈতিক বিধি হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এই দুই তত্ত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য হল যে উভয়ই কর্মের ফল বা ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিবর্তে কর্তব্যবোধকে নৈতিকতার প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। তবে তাদের মৌলিক পার্থক্যও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব মূলত আধ্যাত্মিক মুক্তি ও ঈশ্বরার্পণের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে কর্ম আত্মোন্নতির একটি পথ হিসেবে বিবেচিত। অপরদিকে কান্টের কর্তব্যনীতি সম্পূর্ণভাবে যুক্তি এবং সার্বজনীন নৈতিক বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে নৈতিকতার ভিত্তি ধর্মীয় বিশ্বাস নয় বরং মানবীয় যুক্তি। আমার দৃষ্টিতে, ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং কান্টের কর্তব্যনীতি উভয়ই মানবনৈতিকতার একটি উচ্চতর আদর্শকে প্রতিফলিত করে। এই দুই দর্শনের তুলনামূলক অধ্যয়ন আমাদেরকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৈতিক চিন্তার মধ্যে একটি গভীর বৌদ্ধিক সংলাপের সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। বর্তমান যুগে যখন নৈতিক মূল্যবোধ বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন, তখন এই দুই মহান দার্শনিক ঐতিহ্যের শিক্ষাগুলো মানবসমাজে নৈতিক দায়িত্ববোধ, স্বার্থহীনতা এবং সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Agrawal, M. M., & Mishra, S. K. (2013). *Gita and Kant: An Ethical Study*. Varanasi: Chaukhamba Surbharati Prakashan.
2. Aurobindo, S. (1997). *Essays on the Gita*. Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram.
3. Bhagavad Gītā. (2017). *The Bhagavad Gita* (Chapter 2, Verse 47).
4. Gambhirananda, S. (Trans.). (2008). *Bhagavad Gita with the commentary of Shankaracharya*. Advaita Ashrama.
5. Kant, I. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1785).
6. Kant, I. (1785/2002). Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals (T. K. Abbott, Trans.). Prometheus Books.
7. Paton, H. J. (1964). *The categorical imperative: A study in Kant's moral philosophy*. University of Pennsylvania Press.
8. Radhakrishnan, S. (1948). *The Bhagavadgita*. London: George Allen & Unwin.
9. Russell, B. (2004). *History of Western Philosophy*. Routledge.
10. Tilak, B. G. (2000). *Srimad Bhagavad Gita Rahasya*. Pune: Tilak Brothers.
11. Wood, A. (2014). *Kantian ethics*. Cambridge University Press.